UG ই

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, 13.05.2026,

মীর কাশিমের সাথে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিরোধ থেকে বক্সারের যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রিঃ) পর মীর জাফরকে নবাবের আসনে বসালেও তিনি কোম্পানির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন। মীর জাফরের অক্ষমতা ও ক্রমাগত অসন্তুষ্টি কোম্পানিকে তাকে পদচ্যুত করে তার জামাতা মীর কাশিমকে নবাব বানাতে বাধ্য করে। ১৭৬০ সালে মীর কাশিম বাংলার নবাব হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করলে তিনি দ্রুতই বুঝতে পারেন যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শুধু বাংলার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে না, বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্বও দখল করতে উদ্যত। তাই শুরু হয় স্বার্থসংঘাত, যা একদিকে অর্থনৈতিক বিরোধ, অন্যদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার লড়াই।

মীর কাশিম প্রথমদিকে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু ছাড় দেন। তিনি কোম্পানিকে ৫ লক্ষ টাকা দেন, তার শ্বশুর মীর জাফরের দেনা মেটাতে সাহায্য করেন এবং কিছু জমির ইজারা দেন। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারেন যে নবাবের কর্তৃত্ব ইংরেজদের ছায়ায় ক্রমশ লোপ পাচ্ছে। তিনি নবাবি শাসনকে শক্তিশালী করার জন্য প্রশাসন সংস্কারে মন দেন, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন। এর ফলে ইংরেজদের সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিরোধ তৈরি হয় বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। কোম্পানি ১৬৫১ সালের ফারমান ও ১৭১৭ সালের মুঘল সম্রাট ফররুখসিয়ারের দেওয়া বিশেষ ছাড়ের কারণে বাংলায় শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার ভোগ করছিল। কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারীরা এই সুবিধাকে নিজেদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে কাজে লাগিয়ে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করছিলেন। তাঁরা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা শুরু করেন

এবং শুল্কমুক্তির সুযোগ নিয়ে বাজারে অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করেন। এতে নবাবি কোষাগার যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি দেশীয় ব্যবসায়ীরাও ধ্বংসের পথে যায়। মীর কাশিম এই অনিয়ম বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নেন। তিনি ঘোষণা করেন যে নবাবি রাজস্ব রক্ষার স্বার্থে বিদেশি হোক বা দেশীয়—সবার বাণিজ্য সমান নিয়মে পরিচালিত হবে। অর্থাৎ ইংরেজদের শুল্কমুক্ত বাণিজ্য প্রথা বন্ধ করে দেন।

এই সিদ্ধান্ত ইংরেজ কোম্পানির জন্য ছিল অসহনীয়। কারণ তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় সুবিধাটি এভাবে হারিয়ে যায়। নবাবের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোম্পানির কর্মকর্তারা প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখান এবং নবাবের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক R.C. Majumdar এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—“Mir Kasim was the first Nawab who realized that the prosperity of the Company meant the ruin of Bengal.” এই উপলব্ধিই নবাবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক গভীর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্ররোচিত করেছিল। বাণিজ্য বিরোধের ফলশ্রুতিতে ১৭৬৩ সালে মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। মীর কাশিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তর করে মুঙ্গেরে নিয়ে যান এবং সেখানে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি জার্মান ও ফরাসি ভাড়াটে অফিসারদের সাহায্যে সেনাদের প্রশিক্ষণ দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের সামরিক শক্তিকে মোকাবিলা করা। মীর কাশিম উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধু প্রশাসনিক সংস্কার নয়, ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী অপরিহার্য।

১৭৬৩ সালে কাটওয়া, গিরিয়া ও উদোয়লায় নবাবের সেনা ও ইংরেজ বাহিনীর মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধ হয়। শুরুতে মীর কাশিমের সৈন্যরা কিছু সাফল্য পেলেও ক্রমে ইংরেজদের সামরিক দক্ষতা ও অর্থনৈতিক শক্তির কাছে পরাজিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মীর কাশিম তার রাজধানী মুঙ্গের ছেড়ে অযোধ্যার নবাব শুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয় নেন। শুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলম দ্বিতীয় মীর কাশিমকে সমর্থন দেন। এভাবে বাংলার সীমান্ত

পেরিয়ে বিরোধ সর্বভারতীয় রূপ নেয়। তিন শক্তির একত্রিত প্রতিরোধের মুখোমুখি হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই সংঘাতের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধে। গঙ্গার তীরে বিহারের বক্সার অঞ্চলে ইংরেজ সেনাপতি হেক্টর মনরো নেতৃত্বাধীন বাহিনী একদিকে এবং মীর কাশিম, শুজাউদ্দৌলা ও শাহ আলম দ্বিতীয়ের সম্মিলিত সেনাদল অপরদিকে যুদ্ধ করে। সংখ্যায় সম্মিলিত সেনা ইংরেজদের তুলনায় বহুগুণ বেশি হলেও তারা সমন্বিত নেতৃত্ব ও সুসংগঠিত কৌশলের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ইংরেজদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনী এবং আধুনিক কামানবাহিনী দ্রুত প্রতিপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। শুজাউদ্দৌলার সেনা পালিয়ে যায়, শাহ আলম আত্মসমর্পণ করেন, এবং মীর কাশিম পরাজিত হয়ে অজ্ঞাতবাসে চলে যান। ইতিহাসবিদ Percival Spear এই যুদ্ধকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—“The battle of Buxar was the real climax of the English struggle for supremacy in Bengal. Plassey had opened the gate, Buxar secured the mansion.” অর্থাৎ পলাশী কোম্পানির জন্য বাংলার দরজা খুলে দিয়েছিল, কিন্তু বক্সার তাদের পূর্ণ আধিপত্য নিশ্চিত করেছিল।

বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের জয় এক নতুন যুগের সূচনা করে। এর মাধ্যমে শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরেজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ সালের আগস্ট মাসে আলাহাবাদের চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী মুঘল সম্রাট শাহ আলম দ্বিতীয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার, বিহারের ও উড়িষ্যার দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রদান করেন। মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে প্রাপ্ত এই দেওয়ানি ফারমান কোম্পানির শাসনের বৈধতাকে দৃঢ় করে। এর বিনিময়ে সম্রাটকে কোম্পানি প্রতি বছর ২৬ লক্ষ টাকা ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অপরদিকে শুজাউদ্দৌলা তার রাজ্য ফিরিয়ে পান, তবে ইংরেজদের অধীনস্ত মিত্ররূপে থাকতে হয়। আর মীর জাফরকে পুনরায় বাংলার নবাব হিসেবে বসানো হলেও তিনি শুধু নামমাত্র শাসক, প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে চলে যায়।

দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানি প্রথমবার সরাসরি রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়, যা ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে। এখন আর কোম্পানিকে নবাব বা সম্রাটের দয়া ভিক্ষা করতে হয়নি। তারা নিজেরাই কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ শুরু করে। বাংলার কৃষিজ সম্পদ ও বাণিজ্যিক সম্পদ ইংরেজদের হাতে চলে যায়। রাজস্ব আদায়ের নৃশংসতা ও শোষণ বাংলার কৃষক সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এই শোষণনীতিরই ফল, যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প যেমন সুতি কাপড় ও রেশমশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কারণ ইংরেজরা ভারতে কাঁচামাল রপ্তানি করে নিজেদের শিল্পে ব্যবহার করত, কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকতে দিত না।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে। নবাবি শাসনের কার্যত সমাপ্তি ঘটে এবং কোম্পানি বাংলার প্রকৃত শাসক হয়ে ওঠে। যদিও তারা সরাসরি শাসন চালায়নি, কিন্তু ‘দ্বৈত শাসন’ ব্যবস্থা চালু করে, যেখানে দেওয়ানি কোম্পানির হাতে, আর ফৌজদারি দায়িত্ব নবাবের নামে ছিল। এই দ্বৈত শাসন একদিকে কোম্পানির আয় বাড়ালেও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা বাড়ায়। জনসাধারণের দুর্ভোগও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মীর কাশিম এই ইতিহাসে এক প্রতীকী চরিত্র হয়ে থাকেন। তিনি ইংরেজদের আধিপত্য চ্যালেঞ্জ করার শেষ বড় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তার সংস্কার ও প্রতিরোধ ছিল স্বদেশ রক্ষার সংগ্রাম, যদিও তিনি নিজেও ক্ষমতার জন্য লড়ছিলেন। তবুও তার প্রতিরোধ ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক রূপকে চিহ্নিত করে। তার পরাজয়ের পর আর কোনো দেশীয় শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি দীর্ঘদিন। ইতিহাসবিদ H.H. Dodwell যথার্থই বলেছেন—“The grant of Diwani was the real beginning of British rule in India.” তাই বলা যায়, মীর কাশিমের প্রতিরোধ ব্যর্থ হলেও তার যুগেই ভারতের ইতিহাস এক নতুন পর্বে প্রবেশ করে, যেখানে বিদেশি শাসনের শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত হতে থাকে।

ইঙ্গ মহিশুর সম্পর্ক

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে মহিশুর রাজ্য একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বিশেষত অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই রাজ্যের উত্থান, হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরোধিতা এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজ শক্তির বিস্তার শুধু দক্ষিণ ভারতের রাজনীতির মোড় ঘোরায়নি, বরং গোটা উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। মহিশুর ছিল একটি আঞ্চলিক শক্তি, যা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণে ইংরেজ, ফরাসি ও মারাঠাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটে ইংরেজ-মহিশুর সম্পর্ক মূলত ছিল সংঘাত, কূটনীতি এবং শেষপর্যন্ত উপনিবেশবাদী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। হায়দার আলি ছিলেন একজন অমুসলিম সৈন্যদলের সাধারণ নায়কের পুত্র, যিনি তাঁর সামরিক দক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমতার দ্বারা ধাপে ধাপে মহিশুরের কার্যত শাসক হয়ে ওঠেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেবল বাণিজ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে। তাই তিনি ফরাসিদের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলেছিলেন এবং ইংরেজ শক্তির প্রসার রোধে চেষ্টা করেছিলেন। W. H. Moreland যথার্থই লিখেছেন, “Hyder Ali represented the last of the strong local resistance before the English became undisputed masters of the South.” হায়দার আলি প্রথমে ইংরেজদের সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করতে সফল হন, বিশেষত প্রথম মহিশুর যুদ্ধে (১৭৬৭-১৭৬৯ খ্রিঃ), যেখানে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ইংরেজ বাহিনীকে কঠিন চাপে ফেলেছিলেন।

প্রথম মহিশুর যুদ্ধের ফলে মাদ্রাজের ইংরেজরা হায়দার আলির সাথে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সংঘাত সাময়িক প্রশমন এনেছিল, কারণ ইংরেজরা দক্ষিণে তাদের আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ক্ষমতায় আসেন, যিনি শুধু একজন যোদ্ধাই নন, বরং একজন দূরদর্শী শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনকালেই মহিশুর ইংরেজদের জন্য প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। টিপু নিজেকে "Padshah" আখ্যা দেন এবং দক্ষিণ ভারতে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য গড়ার প্রয়াস চালান। তিনি ফরাসি বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন, অটোমান তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং ইংরেজ বিরোধী বৃহত্তর ঐক্য গড়ার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় মহিশুর যুদ্ধ (১৭৮০-১৭৮৪ খ্রিঃ) ছিল টিপুর উত্থানের সূচক। এই যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের ওপর একাধিকবার বিজয় অর্জন করেন। পোর্টোনোভা ও পোলোয়িলরের মতো যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিঃ মঙ্গলোর চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়, যা টিপুর মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং ইংরেজদের জন্য অপমানজনক ছিল। ইরভিন বলেছিলেন, "Tipu Sultan was the only prince in India whom the English truly feared."

কিন্তু টিপুর সাফল্য স্থায়ী হয়নি। ইংরেজরা ধীরে ধীরে মারাঠা ও হায়দারাবাদের নিজামকে সঙ্গে নিয়ে মহিশুরকে চেপে ধরার কূটনীতি শুরু করে। তৃতীয় মহিশুর যুদ্ধে (১৭৯০-১৭৯২ খ্রিঃ) লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে ইংরেজরা টিপুকে পরাজিত করে। শ্রীরঙ্গপট্টনম চুক্তির মাধ্যমে মহিশুরের অর্ধেক ভূখণ্ড ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকে টিপুর শক্তি ক্রমশ ক্ষয় হতে থাকে। চূড়ান্ত অধ্যায় রচিত হয় চতুর্থ মহিশুর যুদ্ধে (১৭৯৯ খ্রিঃ)। ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী শ্রীরঙ্গপট্টনম আক্রমণ করে। প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও টিপু সুলতান যুদ্ধে নিহত হন। এর মাধ্যমে মহিশুরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং ইংরেজরা দক্ষিণ ভারতের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। টিপুর মৃত্যু দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক যুগের অবসান ঘটায়। বলা হয়ে থাকে, "With the fall of

Seringapatam, the last hope of a united Indian resistance to British expansion perished."

টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজরা মহিশুরে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা না করে, ওয়াদিয়ার বংশকে পুনঃস্থাপন করে। তবে প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজ রেসিডেন্ট ও মাদ্রাজ সরকারের হাতে থাকে। এভাবে মহিশুর কার্যত ইংরেজদের অধীনস্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইংরেজরা প্রশাসনিক সংস্কারের নামে মহিশুরের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিদ্রোহের সম্ভাবনা না থাকে। মহিশুরে ইংরেজ শক্তির বিস্তারের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বহুমুখী। প্রথমত, দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ আধিপত্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল টিপু সুলতান, এবং তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা অবাধে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত, মহিশুর যুদ্ধসমূহ প্রমাণ করে যে ইংরেজরা শুধু সামরিক শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং কূটনৈতিক জোট, অর্থনৈতিক চাপে এবং আঞ্চলিক রাজনীতিকে কাজে লাগিয়েও প্রতিপক্ষকে দুর্বল করত। তৃতীয়ত, টিপু সুলতানের প্রতিরোধ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী প্রতীক হয়ে ওঠে, যা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। মহিশুর যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব নিয়ে H. Dodwell মন্তব্য করেছিলেন, "The Mysore wars cleared the South of any effective opposition and opened the way for the consolidation of British paramountcy in India." সত্যিই, এই যুদ্ধগুলিই প্রমাণ করে ইংরেজরা ধাপে ধাপে প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র শক্তি হয়ে উঠেছিল।

UG ইতিহাস 6th সেমিস্টারের, 6.2 পেপারের স্টাডি নোটস

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, 13.05.2026,

মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব

মারাঠা সাম্রাজ্যের ইতিহাসে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রিঃ) ছিল এক মহত্তম সন্ধিক্ষণ, যা কেবল একটি সামরিক সংঘর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৮ শতকের মধ্যভাগে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু দিল্লির রাজনৈতিক কেন্দ্র তখনও মর্যাদার প্রতীক ছিল। মারাঠারা এই শূন্যস্থান পূরণ করতে চেয়েছিল এবং ক্রমে উত্তর ভারতের সর্বত্র তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৭৫০-এর দশকেই দেখা যায় যে, মারাঠা শক্তি মালওয়া, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য এবং এমনকি বাংলার রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এই সময় আহমদ শাহ আবদালি বা দুররানি আফগানিস্তান থেকে বারবার ভারতে প্রবেশ করে উত্তর ভারতের মুসলিম অভিজাত শ্রেণির আহ্বানে সাম্রাজ্য রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মূলত দিল্লির মুঘল দরবারের দুর্বলতা, আঞ্চলিক নবাবদের বিভক্ত নীতি এবং মারাঠাদের উত্তর ভারতের রাজনীতিতে কর্তৃত্ব কায়েমের চেষ্টা—এই সবকিছু মিলে এক অনিবার্য সংঘর্ষের জন্ম দিয়েছিল।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মারাঠাদের নেতৃত্বে ছিলেন সদাশিব রাও ভাউ এবং তাঁর সহযোদ্ধা বিশিষ্ট যোদ্ধা ভীমা শিন্দে, স্কিন্দিয়া, হোলকার প্রমুখ। অন্যদিকে আবদালির বাহিনী গঠিত হয়েছিল আফগান, পশতুন, রোহিলা, অবধ ও দিল্লির অনেক মুসলিম অভিজাতের সমর্থনে। মারাঠারা দিল্লি পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে রাজধানী দখল করতে সক্ষম হলেও, দীর্ঘ উত্তর ভারতীয় অভিযানে খাদ্য ও রসদ সংগ্রহের অসুবিধা, স্থানীয় হিন্দু রাজ্য যেমন জাট, রাজপুত এবং শিখদের নিরপেক্ষতা অথবা অসহযোগিতা তাদের দুর্বল করে দেয়। জন কে কায়ে যথার্থ মন্তব্য করেছেন: “The Marathas at Panipat stood alone, betrayed by geography, by lack of allies, and by their own overconfidence.”

১৭৬১ সালের ১৪ জানুয়ারি পানিপথের সমতলে যে ভয়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল সমসাময়িক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সংঘর্ষ। অনুমান করা হয় যে, উভয় পক্ষ মিলিয়ে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ নেয়, যেখানে মারাঠাদের যুদ্ধকৌশল মূলত

অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর নির্ভরশীল হলেও, আবদালি শৃঙ্খলাবদ্ধ পদাতিক ও কামানবাহিনী ব্যবহার করেন। প্রথম পর্যায়ে মারাঠারা প্রতাপের সাথে লড়লেও, দিনের শেষে তারা ভীষণভাবে পরাজিত হয়। সদাশিব রাও ভাউ এবং বিষ্ণু পান্ডিত ভিষ্ণুনাথ সহ মারাঠা নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ নিহত হয়। সমকালীন ফরাসি বণিক আব্বে দু বোই মন্তব্য করেছিলেন: “It was not merely a defeat; it was a massacre that broke the backbone of Maratha ambition in the North.”

এই যুদ্ধে পরাজয়ের তাৎক্ষণিক ফল ছিল মারাঠা শক্তির উত্তর ভারতে একপ্রকার সম্পূর্ণ বিপর্যয়। দিল্লির নিয়ন্ত্রণ আবার আফগান ও মুঘল শক্তির হাতে গেলেও, আবদালি স্থায়ীভাবে ভারতে কোনো শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না। তবে দীর্ঘমেয়াদে এর প্রভাব ছিল বহুমাত্রিক। প্রথমত, মারাঠারা এই পরাজয়ের ধাক্কায় এক দশকেরও বেশি সময় রাজনৈতিক পুনর্গঠন ও শক্তি সঞ্চয়ে ব্যয় করে। দ্বিতীয়ত, উত্তর ভারতের হিন্দু রাজ্যগুলি যেমন রাজপুত, জাট বা শিখরা মারাঠাদের উপর আস্থা রাখতে দ্বিধা করে এবং ক্রমশ স্বাধীন শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তৃতীয়ত, মুঘল সাম্রাজ্য চূড়ান্তভাবে একটি নামমাত্র প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়; প্রকৃত ক্ষমতা স্থানীয় শক্তিগুলির হাতে ছড়িয়ে পড়ে। চতুর্থত, ইউরোপীয় শক্তি, বিশেষত ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, মারাঠাদের বিপর্যয়কে একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে দেখে এবং ক্রমশ তাদের আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে।

এ যুদ্ধ নিয়ে ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ভিনসেন্ট স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন: “Panipat was the Waterloo of the Marathas, but unlike Napoleon, they rose again, though only to fall before a greater enemy—the English.” সত্যিই, ১৭৭০-এর দশক থেকে মারাঠারা আবার সংগঠিত হয়ে হিন্দুস্থান দখলের চেষ্টা করলেও, ব্রিটিশ শক্তির সামরিক দক্ষতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সামনে তারা বারবার ব্যর্থ হয়। সুতরাং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ একদিকে যেমন মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারের স্বপ্নকে ভেঙে দেয়, অন্যদিকে ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের জন্য রাজনৈতিক মাটিকে প্রস্তুত করে।

এ যুদ্ধের সামাজিক প্রভাবও বিস্তৃত ছিল। হাজার হাজার সৈন্য ও সাধারণ মানুষের মৃত্যু, গ্রামাঞ্চলের ধ্বংস, খাদ্যাভাব ও মহামারীর কারণে উত্তর ভারতের সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি বহু সমসাময়িক কাব্য ও লোকগীতে এই বিপর্যয়ের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের কবি ভাভানি শঙ্কর বর্ণনা করেছেন যে, "মরাঠা শক্তি যেন রক্তের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে গেল।" এভাবে মারাঠা জনগণের মনে এক গভীর ট্র্যাজেডির স্মৃতি চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

সার্বিকভাবে বিচার করলে, তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ শুধু একটি সামরিক সংঘর্ষ নয়, বরং ভারতীয় ইতিহাসের রাজনৈতিক ভারসাম্যকে পাল্টে দেওয়া এক যুগান্তকারী ঘটনা। এটি প্রমাণ করেছিল যে, আঞ্চলিক শক্তি মারাঠারা যতই প্রবল হোক না কেন, এককভাবে সমগ্র ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় যদি না তারা স্থানীয় শক্তিগুলিকে নিজেদের সাথে মিলিত করতে পারে। একইসাথে, এটি ভারতের ইতিহাসে একটি ক্ষমতাশূন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। ইতিহাসবিদ সি.এ. বেইলি তাই যথার্থই বলেছেন: "Panipat did not merely end a war, it ended an age and heralded the advent of a new imperial power."

UG ইতিহাস 6th সেমিস্টারের, 6.2 পেপারের স্টাডি নোটস

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, 13.05.2026,

পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং এর উত্থান এবং ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক

রণজিৎ সিং জন্মেছিলেন ১৭৮০ সালে গুজরানওয়ালায়, সুকেরচকিয়া মিসলের নেতা মাহা সিং এর পরিবারে। অল্প বয়সেই তিনি নেতৃত্বে আসেন, এবং শিখ মিসলগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে একক শক্তিতে পরিণত হন। মিসল ব্যবস্থা, যা মূলত একটি সামরিক-গণতান্ত্রিক কাঠামো ছিল, অষ্টাদশ শতকের শেষ

দিকে কার্যত অরাজকতায় পরিণত হয়েছিল। একদিকে আফগান আক্রমণ, অন্যদিকে স্থানীয় জমিদারদের স্বার্থান্বেষী দ্বন্দ্ব—এসবের মধ্যে রণজিৎ সিং সামরিক দক্ষতা, কূটনৈতিক বুদ্ধি এবং ধর্মীয় সহনশীলতা প্রদর্শন করে শিখ শক্তিকে পুনর্গঠন করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি লাহোর দখল করেন, যা ছিল মুঘলদের পতনের পর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকী পদক্ষেপ। লাহোর দখলের মাধ্যমে রণজিৎ সিং কেবল একটি রাজধানীই অর্জন করেননি, বরং শিখ শক্তির রাজনৈতিক কেন্দ্রীয়করণের সূচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক H. T. Prinsep যথার্থই লিখেছেন, "Ranjit Singh was not merely a conqueror; he was a consolidator of power in a land long torn by factions."

তারপরের এক দশকে রণজিৎ সিং একের পর এক অভিযান পরিচালনা করে সমগ্র পাঞ্জাবকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিশেষ করে কাশ্মীর, পেশোয়ার, মালওয়া, ও অটক দখল তাঁর শক্তিকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক অনন্য অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশদের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার পর ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাদের প্রভাব বিস্তার করছিল। কিন্তু আফগান শক্তির ক্রমহ্রাসমান প্রভাব এবং শিখ শক্তির ক্রমবর্ধমান অবস্থান তাদেরকে নতুন কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণে বাধ্য করে। ১৮০৯ সালে ব্রিটিশ ও রণজিৎ সিং এর মধ্যে ‘Treaty of Amritsar’ স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে স্থির করা হয় যে রণজিৎ সিং শত্রুজোট ভাঙার চেষ্টা করবেন না, সুতলজ নদীর পূর্বে ব্রিটিশ প্রাধান্য থাকবে, আর পশ্চিমে রণজিৎ সিং স্বাধীনভাবে নিজের শক্তি বজায় রাখবেন। ইতিহাসবিদ John Keay এর ভাষায়, "The Treaty of Amritsar was less a compromise than a tacit recognition of Ranjit Singh’s real power."

এই চুক্তি রণজিৎ সিং এর কূটনৈতিক প্রজ্ঞার নিদর্শন। তিনি বুঝেছিলেন সরাসরি ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়া শিখ সাম্রাজ্যের জন্য বিপজ্জনক হবে, আবার ইংরেজদের পূর্ণ আধিপত্যও মেনে নেওয়া যাবে না। তাই তিনি সীমারেখা নির্ধারণ করে পশ্চিমে আফগানদের সঙ্গে সংঘর্ষে মনোনিবেশ করলেন এবং পূর্বে ইংরেজদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বী না ভেবে মিত্র

হিসেবে দেখালেন। এর ফলে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকেও রণজিৎ সিং এর প্রতি একধরনের সম্মান প্রদর্শিত হয়। আসলে রণজিৎ সিং ছিলেন এক দুর্দান্ত সামরিক সংগঠক; তিনি ইউরোপীয় সেনা কর্মকর্তাদের (যেমন ভেন্টুরা, অলোবুজ, কোর্ট প্রভৃতি) নিয়োগ করে তাঁর সেনাবাহিনীকে আধুনিকীকরণ করেছিলেন। ফরাসি ও ইতালীয় ভাড়াটে সেনাপতিদের মাধ্যমে তিনি কামানবাহিনী ও পদাতিক বাহিনীকে আধুনিক রূপ দেন। এর ফলে তাঁর সেনা একদিকে ঐতিহ্যবাহী শিখ যোদ্ধাদের সাহসের ধারাকে ধরে রাখল, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপীয় সেনা কৌশলের রূপও পেল। ইংরেজরা এই শক্তিকে শ্রদ্ধা করত এবং একই সঙ্গে আশঙ্কাও করত।

তবে রণজিৎ সিং এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন একজন শিখ শাসক, কিন্তু তাঁর প্রশাসনে হিন্দু, মুসলমান, এমনকি ইউরোপীয় কর্মকর্তাদেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। লাহোর দরবারে বৈচিত্র্যময় প্রশাসনিক কাঠামো ছিল, যা একধরনের ধর্মীয় সহনশীলতা এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এর ফলে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং বহুধর্মীয় সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতীক। ব্রিটিশরা একে দেখেছিল তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বাধা হিসেবে, কারণ পাঞ্জাবের জনগণ তখনও ইংরেজদের পূর্ণ কর্তৃত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। রণজিৎ সিং এর মৃত্যুর (১৮৩৯) পর পাঞ্জাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা দুর্বল এবং বিভক্ত ছিলেন। ব্রিটিশরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে প্রথমে কূটনীতির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে, পরে দুই দফা ‘Anglo-Sikh War’ (১৮৪৫–৪৬ এবং ১৮৪৮–৪৯) এর মাধ্যমে পাঞ্জাবকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কিন্তু রণজিৎ সিং জীবিত থাকাকালে তাঁরা সরাসরি সংঘর্ষে যায়নি। এক অর্থে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দক্ষতাই শিখ সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা চার দশক ধরে টিকিয়ে রেখেছিল। ব্রিটিশ প্রশাসক Henry Lawrence একবার মন্তব্য করেছিলেন, "So long as Ranjit Singh lived, the British frontier was secure not because of our strength, but because of his will."

সুতরাং দেখা যায়, রণজিৎ সিং এর উত্থান ছিল আঞ্চলিক অরাজকতার প্রেক্ষিতে এক অসাধারণ নেতৃত্বের প্রকাশ। তিনি সামরিক, কূটনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বহুমুখী দক্ষতার মাধ্যমে শিখ শক্তিকে একত্র করেছিলেন এবং পাঞ্জাবকে উনবিংশ শতকে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল জটিল—একদিকে মিত্রতার সীমারেখা নির্ধারণ, অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। তিনি ছিলেন এমন এক শাসক যিনি বুঝেছিলেন কূটনৈতিক ভারসাম্যের গুরুত্ব, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই প্রমাণিত হয় যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছাড়া শিখ সাম্রাজ্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির বিস্তার রুখে রাখতে পারেনি।।এইভাবে মহারাজা রণজিৎ সিং এর উত্থান ও ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক ভারতীয় ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন এমন এক শাসক, যিনি স্থানীয় আঞ্চলিক শক্তির ভাঙাগড়া ও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের সংঘর্ষময় যুগে শিখ শক্তিকে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর নাম আজও পাঞ্জাবের ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ের প্রতীক হয়ে আছে।

UG ইতিহাস 6th সেমিস্টারের, 6.2 পেপারের স্টাডি নোটস

ড. সুদীপ্ত সাধুখাঁ, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, 13.05.2026,